ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সরকারি ক্রয়ে সুশাসন:
বাংলাদেশে ই-জিপি'র কার্যকরতা পর্যবেক্ষণ

সার-সংক্ষেপ

১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০

সরকারি ক্রয়ে সুশাসন: বাংলাদেশে ই-জিপি'র কার্যকরতা পর্যবেক্ষণ

উপদেষ্টা
ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষক দল
শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
নাহিদ শারমীন, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
মো. শহিদুল ইসলাম, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন
সব মুখ্য তথ্যদাতা যারা তাঁদের মূল্যবান মতামত দিয়ে এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে সহায়তা করেছেন তাঁদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। খসড়া গবেষণা প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, এবং প্রতিবেদনের উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), (পুরনো ২৭)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সরকারি ক্রয়ে সুশাসন:
বাংলাদেশে ই-জিপি'র কার্যকরতা পর্যবেক্ষণ

সার-সংক্ষেপ

১. প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের মাধ্যমে যৌথভাবে বাস্তবায়িত 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রিফর্ম প্রজেক্ট টু' (২০০৮-২০১৬) এর অন্যতম উপাদান হিসেবে ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (সংক্ষেপে ই-জিপি) প্রবর্তিত হয়। ২০২১ সালের মধ্যে সমস্ত সরকারি পরিষেবা ডিজিটাল করার সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ২০১১ সালের ২ জুন থেকে সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করতে 'সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট' (সিপিটিইউ) ই-জিপি পোর্টাল চালু করে। একইসাথে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ (ধারা ৬৫) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ (বিধি-১২৮) অনুসারে 'বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) গাইডলাইন ২০১১' প্রণয়ন করা হয়।

প্রাথমিকভাবে চারটি প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ই-জিপি বাস্তবায়ন শুরু হয় - স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), সড়ক ও জনপথ (সওজ), পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো), এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি)। বর্তমানে ই-জিপি বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট প্রকল্প (ডিআইএমএপিপিপি) ডিজিটালকরণ চলমান, যা বাস্তবায়নের সময় ২০১৭ সালের জুলাই থেকে ২০২২ সালের জুন পর্যন্ত। সব প্রতিষ্ঠানের ই-জিপি ব্যবস্থাপনা করছে সিপিটিইউ। এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত তথ্য অনুযায়ী ই-জিপি'তে ৪৭টি মন্ত্রণালয়, ২৭টি বিভাগ, ১,৩৬২টি সরকারি ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান, এবং ৬১,৪১৭টি দরপত্রদাতা নিবন্ধিত রয়েছে। ই-জিপি'কে সহজ করার জন্য সিপিটিইউ-এর উদ্যোগে ই-জিপি'র ওপর প্রায় ১৬,০০০ বিভিন্ন অংশীজনকে (ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, ঠিকাদার) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১.১. গবেষণার যৌক্তিকতা

বিশ্বব্যাপী সরকারি খাতে সরকারি ক্রয় দুর্নীতির অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে চিহ্নিত। এই খাতে দুর্নীতির জন্য বিশ্বব্যাপী বছরে কমপক্ষে ৪০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতি হয়। এর ফলে প্রাক্কলিত অর্থনৈতিক ক্ষতি বার্ষিক জিডিপি'র ১.৫% এরও বেশি। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় বাংলাদেশেও সরকারি ক্রয়ে দুর্নীতি একটি বড় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বিভিন্ন সরকারি খাত (যেমন বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ, স্বাস্থ্য, জলবায়ু অর্থায়ন) ও প্রতিষ্ঠানের (যেমন বাংলাদেশ বিমান, সিএজি, এলজিইডি, পাউবো, এনসিটিবি) ওপর ট্রান্সপারেন্সি ইন্টার‍্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) সম্পন্ন গবেষণায় ক্রয়-সংক্রান্ত বিষয়ে দুর্নীতির বিভিন্ন ঘটনা উদঘাটিত হয়েছে, যার ফলে ক্রয় বাজেটের একটি বড় অংশের ক্ষতি (৮.৫% থেকে ২৭%) পরিলক্ষিত হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে (এসডিজি ২০৩০) "জাতীয় নীতি ও অগ্রাধিকার অনুসারে টেকসইযোগ্য সরকারি ক্রয়কে উৎসাহিত করতে হবে" বলে উল্লেখ করা হয়েছে (লক্ষ্য ১২.৭)। জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশন অনুযায়ী প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্র দুর্নীতি প্রতিরোধ করার জন্য স্বচ্ছতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নৈর্ব্যক্তিক শর্তবিশিষ্ট সরকারি ক্রয়কাঠামো প্রবর্তন করবে। জাতিসংঘ ও কনভেনশনের সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে উপরোক্ত শর্ত পূরণে বাংলাদেশও অঙ্গীকারবদ্ধ।

ই-জিপি প্রবর্তনের প্রায় একদশক পর বাংলাদেশে ই-জিপি'র প্রয়োগ ও কার্যকরতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান কোন মাত্রায় ই-জিপি'র চর্চা করছে, সরকারি ক্রয়ের ধরন ও প্রকৃতি বিবেচনা করে প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কিনা, সব সরকারি প্রতিষ্ঠান সব ধরনের ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি ব্যবহার করে কিনা, ই-জিপি বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতাগুলো কী কী, ই-জিপি প্রবর্তন করার ফলে সুশাসনের ক্ষেত্রে কোনো গুণগত পার্থক্য বা উন্নতি হয়েছে কিনা, এর ফলে দুর্নীতি বা অনিয়ম কমেছে কিনা, এবং প্রাপ্ত পণ্য, সম্পাদিত কাজ বা গৃহীত সেবার মানের কোনো উন্নতি হয়েছে কিনা ইত্যাদি বিষয়গুলো জানার প্রয়োজন অনুভূত হয়। বাংলাদেশে ই-জিপি'র ব্যবহার নিয়ে সম্পন্ন বেশিরভাগ গবেষণায় ই-জিপি ব্যবহারের ইতিবাচক প্রভাব, ক্রয় প্রক্রিয়ার প্রবণতা ও জনগণের তদারকির প্রভাব আলোচিত হলেও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে ই-জিপি'র মাধ্যমে সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তার ওপর বিস্তারিত গবেষণার ঘাটতির প্রেক্ষিতে টিআইবি এ গবেষণা সম্পন্ন করেছে।

১.২. গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য বাংলাদেশের সরকারি ক্রয় খাতে সুশাসনের আঙ্গিকে ই-জিপি'র প্রয়োগ ও কার্যকরতা পর্যালোচনা করা। গবেষণার বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে

১. বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে ক্রয় আইন ও বিধি অনুযায়ী ই-জিপি কতটুকু অনুসরণ করা হয় তা চিহ্নিত করা;
২. ই-জিপি যথাযথভাবে অনুসরণ না হলে তার কারণ অনুসন্ধান করা;
৩. বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে ই-জিপি'র কার্যকরতা পর্যালোচনা করা; এবং
৪. ই-জিপি'র প্রয়োগে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের উপায় সুপারিশ করা।

১.৩. গবেষণা পদ্ধতি

এটি একটি গুণগত গবেষণা। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রেও গুণগত পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়েছে, তবে প্রয়োজন অনুযায়ী সংখ্যাগত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য ই-জিপি বাস্তবায়নকারী প্রথম দিকের প্রতিষ্ঠান হিসেবে চারটি সরকারি প্রতিষ্ঠান বাছাই করা হয়েছে - স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), সড়ক ও জনপথ বিভাগ (সওজ), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো), এবং পল্লি বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি)। উল্লেখ্য, ২০১৯-২০ অর্থবছরে চারটি প্রতিষ্ঠানে বরাদ্দ ছিল এডিপি'র প্রায় ২০ শতাংশ।

গবেষণায় আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত 'ট্রাফিক সিগন্যাল পদ্ধতি' ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, ই-জিপি প্রক্রিয়া, ই-জিপি ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং কার্যকরতা - এই পাঁচটি ক্ষেত্রের অধীনে ২০টি নির্দেশকের ভিত্তিতে ওপরের প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরকারি ক্রয় আইন কতটুকু পালন করা হয় তা পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রত্যেক নির্দেশককে উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন স্কোর দিয়ে তাদের অবস্থান বোঝানো হয়েছে, যা তিনটি রংয়ের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। পূর্ব-নির্ধারিত শর্তের ভিত্তিতে প্রত্যেক নির্দেশকের স্কোর দেওয়া হয়েছে ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সারণি ১: গবেষণায় ব্যবহৃত স্কোরের মান

উচ্চ স্কোর	২	সবুজ
মধ্যম স্কোর	১	হলুদ
নিম্ন স্কোর	০	লাল

সারণি ২: একনজরে ক্ষেত্র ও নির্দেশক

ক্ষেত্র	নির্দেশক	
প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা	১. আর্থিক সক্ষমতা ২. ভৌত সক্ষমতা ৩. কারিগরি সক্ষমতা ৪. মানবসম্পদ	৫. ই-জিপি'র ব্যবহার ৬. বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) ৭. ক্রয় সীমা
ই-জিপি প্রক্রিয়া	৮. ই-জিপি'তে নিবন্ধন ৯. টেন্ডার ওপেনিং প্রক্রিয়া ১০. প্রাক টেন্ডার মিটিং	১১. ই-বিজ্ঞাপন ১২. দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ১৩. সিদ্ধান্ত গ্রহণ
ই-জিপি ব্যবস্থাপনা	১৪. ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা	১৫. কার্যাদেশ বাস্তবায়ন তদারকি
স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা	১৬. অভিযোগ নিষ্পত্তি ১৭. নিরীক্ষা	১৮. কর্মচারীদের সম্পদের তথ্য প্রকাশ
কার্যকরতা	১৯. অনিয়ম ও দুর্নীতি	২০. কাজের মান

১.৪. স্কোরিং পদ্ধতি

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একটি ক্ষেত্রের মোট স্কোর পাওয়ার জন্য ঐ ক্ষেত্রের সবগুলো নির্দেশকের স্কোর প্রথমে যোগ করা হয়েছে। এরপর ঐ ক্ষেত্রে যতগুলো নির্দেশক রয়েছে তার সম্ভাব্য সর্বোচ্চ স্কোরের সাপেক্ষে এর শতকরা হার বের করা হয়েছে। যেমন, একটি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রথম ক্ষেত্রের (প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা) নির্দেশকগুলোর মোট স্কোর ৮ (দুইটি নির্দেশক ২ করে, চারটি নির্দেশক ১ করে এবং একটি নির্দেশক ০ পেয়েছে)। এই ক্ষেত্রের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ স্কোর ১৪ (৭টি নির্দেশক X প্রত্যেক নির্দেশকের সর্বোচ্চ স্কোর ২ ধরে)। কাজেই প্রথম ক্ষেত্রের চূড়ান্ত স্কোর ৮/১৪ X ১০০ = ৬০%। কোনো প্রতিষ্ঠানের সার্বিক স্কোর পাওয়ার জন্য সবগুলো নির্দেশকের মোট সর্বোচ্চ স্কোরের সাপেক্ষে ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্ত মোট স্কোরের শতাংশ হিসাব করা হয়েছে। যেমন, কোনো প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মোট স্কোর ১৭ হলে মোট স্কোর হবে ১৭/৪০ X ১০০ = ৪২%। সবশেষে সার্বিক স্কোরকে কয়েকটি গ্রেডে ভাগ করা হয়েছে, এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের স্কোর অনুযায়ী গ্রেড দেওয়া হয়েছে। স্কোরের গ্রেডগুলো হচ্ছে 'ভালো' (৮১% বা তার বেশি); 'সন্তোষজনক' (৬১%-৮০%); 'ভালো নয়' (৪১%-৬০%); 'উদ্বেগজনক' (৪০% বা তার নিচে)।

১.৫. তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও সময়

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সর্বনিম্ন যে পর্যন্ত ক্রয় করার অনুমোদন রয়েছে সেই পর্যায় পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সুবিধাজনক নমুনায়নের মাধ্যমে সারা দেশে চারটি প্রশাসনিক বিভাগের একটি করে জেলা এবং সে জেলার একটি উপজেলা পর্যায়ে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অবস্থিত কার্যালয় ও ঢাকায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এভাবে চারটি প্রতিষ্ঠানের মোট ৫২টি কার্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য সাক্ষাৎকার ও দলগত আলোচনা ব্যবহার করা হয়েছে, এবং তথ্যের প্রাথমিক উৎস হিসেবে ক্রয় বিশেষজ্ঞ, গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী, ঠিকাদার, এবং সংবাদ-মাধ্যম কর্মীদের সাথে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ও নিবিড় সাক্ষাৎকার (মোট ১৭৭ জনের) গ্রহণ করা হয়েছে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের ওপর দলগত আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া পরোক্ষ উৎস হিসেবে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি, গবেষণা প্রতিবেদন, বই ও প্রবন্ধ, প্রাতিষ্ঠানিক বার্ষিক প্রতিবেদন, নিরীক্ষা প্রতিবেদন, সংবাদপত্র, ওয়েবসাইট থেকে তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২০১৯ এর জুলাই থেকে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

২. গবেষণার ফলাফল

২.১. ই-জিপি'র প্রেক্ষাপট ও কাঠামো

বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী 'ক্রয়' বলতে কোনো চুক্তির অধীন পণ্য সংগ্রহ বা ভাড়া করা বা সংগ্রহ ও ভাড়ার মাধ্যমে পণ্য আহরণ এবং কার্য বা সেবা সম্পাদন করাকে বোঝানো হয় [সরকারি ক্রয় আইন ২০০৬, ধারা ২(৭)]। একই আইনের অধীন সরকারি তহবিল ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো ক্রয়কারী কর্তৃক ক্রয় করা হলো 'সরকারি ক্রয়' [ধারা ২ (৩২)]। সরকারি ক্রয় আমাদের দেশের অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের একটি বড় অংশই সরকারি ক্রয়ের মাধ্যমে সাধিত হয়। ২০০৩ সাল পর্যন্ত সাধারণ আর্থিক বিধিমালার একটি সংকলনের (সিজিএফআর) মাধ্যমে সরকারি ক্রয় পদ্ধতি ও চর্চা নিয়ন্ত্রণ করা হতো। সরকারি ক্রয়ে সংস্কারের অংশ হিসেবে ২০০২ সালে পরিকল্পনা কমিশনের বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ বিভাগের (আইএমইডি) অধীনে সিপিটিইউ গঠন করা হয়। ২০০৬ সালে একটি পূর্ণাঙ্গ 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন' প্রণীত হয় এবং ২০০৮ সালে 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি' (পিপিআর) জারি করা হয়। ২০০৮ সালের জানুয়ারিতে আইন ও বিধিমালা কার্যকর করা হয়।

একটি জাতীয় পোর্টাল হিসেবে ই-জিপি সিস্টেম তৈরি করা হয়, যা ব্যবহার করে সব ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান নিরাপদ ওয়েব ড্যাশবোর্ড ব্যবহার করে যাবতীয় ক্রয়কার্য সম্পাদন করতে পারে। ই-জিপি সিস্টেমে যেসব কাজ সম্পাদন করা যায় সেগুলো হলো - বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা, দরপত্র আহবান করা, প্রস্তাবের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন, কোটেশনের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন, দরপত্র/ আবেদন/ প্রস্তাব তৈরি ও জমা, দরপত্র উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন, চুক্তি সম্পাদন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, চুক্তি ব্যবস্থাপনা, আর্থিক লেনদেন, ইনফরমেশন সিস্টেমের প্রধান প্রধান নির্দেশকের মাধ্যমে সম্পাদিত কার্যাবলী পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং সংশোধন।

চিত্র ১: ই-জিপি প্রক্রিয়া

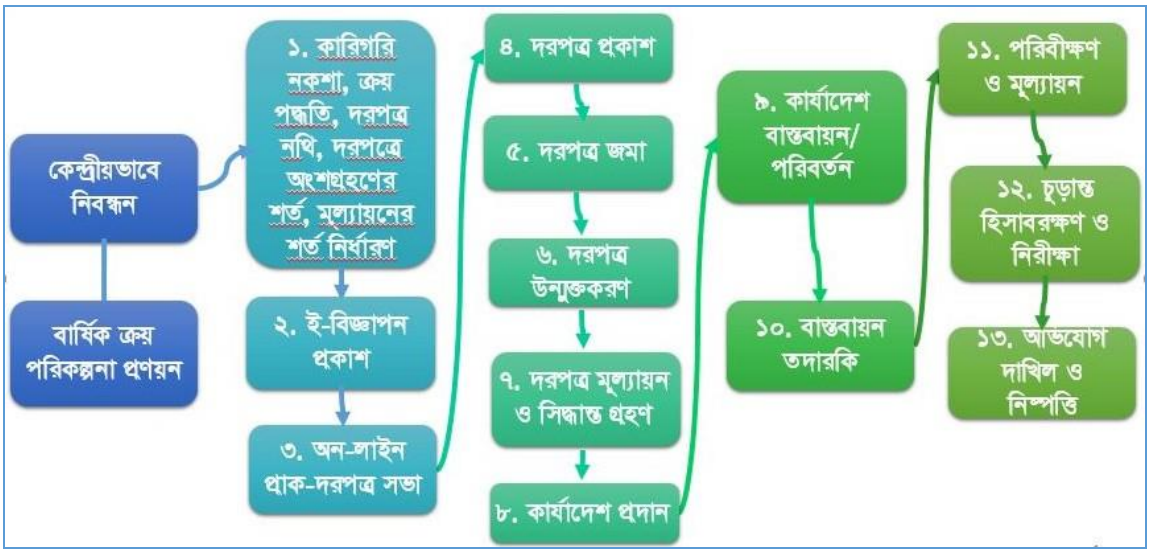

২.২. সার্বিক স্কোর

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সবগুলো প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্কোর পেয়েছে সড়ক ও জনপথ (সওজ) (৫০%)। এর পরে রয়েছে পল্লী বিদ্যুৎ (আরইবি) (৪৪%), পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) (৪৩%), এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) (৪২%) (চিত্র ২ দ্রষ্টব্য)। প্রাপ্ত সার্বিক স্কোর অনুসারে সবগুলো প্রতিষ্ঠানের অবস্থানই 'ভালো নয়' গ্রেডে।

প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাপ্ত স্কোর থেকে দেখা যায় সবগুলো প্রতিষ্ঠানই প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ক্ষেত্রে মোটামুটি ভালো ও প্রায় কাছাকাছি অবস্থানে (৬০%-৭৫%), তবে সওজ ও আরইবি'র সক্ষমতা অন্য দুটো প্রতিষ্ঠানের তুলনামূলকভাবে ভালো। ই-জিপি প্রক্রিয়া মেনে চলার ক্ষেত্রে প্রায় সব প্রতিষ্ঠান কাছাকাছি অবস্থানে (৫৮-৬৪%) রয়েছে। অন্যদিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এখনো অনেক উন্নতির সুযোগ রয়েছে। ই-জিপি ব্যবস্থাপনা এবং কার্যকরতায় কোনো প্রতিষ্ঠানই কোনো স্কোর পায় নি বলে দেখা যায়। আবার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে সব প্রতিষ্ঠানের স্কোর অনেক কম (১৯-৩০%)।

সারণি ৪: একনজরে সব নির্দেশকে প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থান

ক্ষেত্র	এলজিইডি	সওজ	পাউবো	আরইবি
প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা	আর্থিক সক্ষমতা	আর্থিক সক্ষমতা	আর্থিক সক্ষমতা	আর্থিক সক্ষমতা
	ভৌত সক্ষমতা	ভৌত সক্ষমতা	ভৌত সক্ষমতা	ভৌত সক্ষমতা
	কারিগরি সক্ষমতা	কারিগরি সক্ষমতা	কারিগরি সক্ষমতা	কারিগরি সক্ষমতা
	মানবসম্পদ	মানবসম্পদ	মানবসম্পদ	মানবসম্পদ
	ই-জিপি'র ব্যবহার	ই-জিপি'র ব্যবহার	ই-জিপি'র ব্যবহার	ই-জিপি'র ব্যবহার

ক্ষেত্র	এলজিইডি	সওজ	পাউবো	আরইবি
	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
	ক্রয় সীমা	ক্রয় সীমা	ক্রয় সীমা	ক্রয় সীমা
ই-জিপি প্রক্রিয়া	ই-জিপি'তে নিবন্ধন	ই-জিপি'তে নিবন্ধন	ই-জিপি'তে নিবন্ধন	ই-জিপি'তে নিবন্ধন
	টেন্ডার ওপেনিং প্রক্রিয়া	টেন্ডার ওপেনিং প্রক্রিয়া	টেন্ডার ওপেনিং প্রক্রিয়া	টেন্ডার ওপেনিং প্রক্রিয়া
	প্রাক টেন্ডার মিটিং	প্রাক টেন্ডার মিটিং	প্রাক টেন্ডার মিটিং	প্রাক টেন্ডার মিটিং
	ই-বিজ্ঞাপন	ই-বিজ্ঞাপন	ই-বিজ্ঞাপন	ই-বিজ্ঞাপন
	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া
	সিদ্ধান্ত গ্রহণ	সিদ্ধান্ত গ্রহণ	সিদ্ধান্ত গ্রহণ	সিদ্ধান্ত গ্রহণ
ই-জিপি ব্যবস্থাপনা	ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা	ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা	ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা	ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা
	কার্যাদেশ বাস্তবায়ন তদারকি	কার্যাদেশ বাস্তবায়ন তদারকি	কার্যাদেশ বাস্তবায়ন তদারকি	কার্যাদেশ বাস্তবায়ন তদারকি
স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা	অভিযোগ নিষ্পত্তি	অভিযোগ নিষ্পত্তি	অভিযোগ নিষ্পত্তি	অভিযোগ নিষ্পত্তি
	নিরীক্ষা	নিরীক্ষা	নিরীক্ষা	নিরীক্ষা
	কর্মচারীদের সম্পদের তথ্য প্রকাশ	কর্মচারীদের সম্পদের তথ্য প্রকাশ	কর্মচারীদের সম্পদের তথ্য প্রকাশ	কর্মচারীদের সম্পদের তথ্য প্রকাশ
কার্যকরতা	অনিয়ম ও দুর্নীতি	অনিয়ম ও দুর্নীতি	অনিয়ম ও দুর্নীতি	অনিয়ম ও দুর্নীতি
	কাজের মান	কাজের মান	কাজের মান	কাজের মান

চিত্র ২: সার্বিক স্কোর

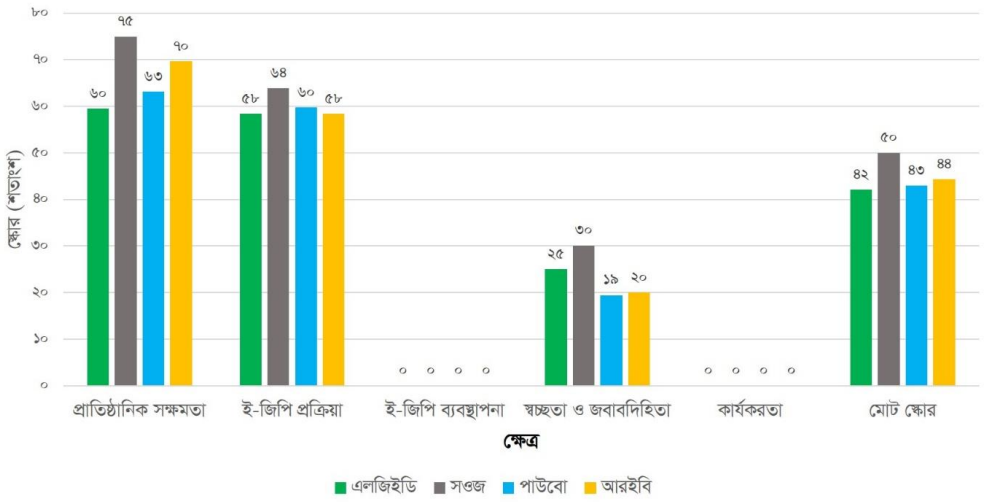

গবেষণার স্কোর থেকে আরও দেখা যায় সবচেয়ে বেশি নয়টি নির্দেশকে উচ্চ স্কোর পেয়েছে সওজ; এরপরেই রয়েছে আরইবি (ছয়টি নির্দেশকে উচ্চ স্কোর)। মধ্যম স্কোর সবচেয়ে বেশি নির্দেশকে পেয়েছে এলজিইডি ও পাউবো (সাতটি নির্দেশকে)। অন্যদিকে সবগুলো প্রতিষ্ঠানই সবচেয়ে বেশি নিম্ন স্কোর পেয়েছে আটটি নির্দেশকে (বিস্তারিত চিত্র ৩)। একনজরে সবগুলো প্রতিষ্ঠানের সব নির্দেশকে অবস্থান দেখানো হয়েছে সারণি ৩-এ।

চিত্র ৩: প্রতিষ্ঠান ও ধরনভেদে স্কোর

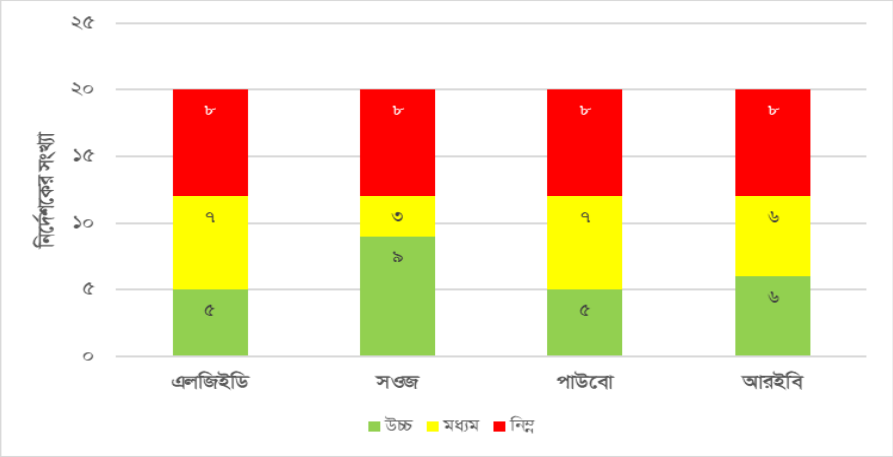

সারণি ৩: একনজরে গ্রেডিং

ক্ষেত্র	এলজিইডি	সওজ	পাউবো	আরইবি
প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা	ঘাটতিপূর্ণ	সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	সন্তোষজনক
ই-জিপি প্রক্রিয়া	ঘাটতিপূর্ণ	সন্তোষজনক	ঘাটতিপূর্ণ	ঘাটতিপূর্ণ
ই-জিপি ব্যবস্থাপনা	উদ্বেগজনক	উদ্বেগজনক	উদ্বেগজনক	উদ্বেগজনক
স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা	উদ্বেগজনক	উদ্বেগজনক	উদ্বেগজনক	উদ্বেগজনক
কার্যকরতা	উদ্বেগজনক	উদ্বেগজনক	উদ্বেগজনক	উদ্বেগজনক
সার্বিক স্কোর	ঘাটতিপূর্ণ	ঘাটতিপূর্ণ	ঘাটতিপূর্ণ	ঘাটতিপূর্ণ

গ্রেডিং অনুযায়ী সব প্রতিষ্ঠানের অবস্থান সার্বিকভাবে ঘাটতিপূর্ণ। তবে ই-জিপি ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং কার্যকরতায় অবস্থান উদ্বেগজনক। যেসব নির্দেশকে অবস্থান উদ্বেগজনক সেগুলো হচ্ছে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা, প্রাক-দরপত্র সভা, ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা, কার্যাদেশ বাস্তবায়ন তদারকি, নিরীক্ষা, কর্মচারীদের সম্পদের তথ্য প্রকাশ, অনিয়ম ও দুর্নীতি, এবং কাজের মান।

ক্ষেত্র ১: প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি স্কোর পেয়েছে সওজ (৭৫%); এর পরেই রয়েছে পাউবো (৬৩%)। দেখা যায় গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সবগুলো প্রতিষ্ঠানেই ই-জিপি পরিচালনার জন্য আর্থিক সক্ষমতা রয়েছে, এবং ই-জিপি পরিচালনার জন্য আলাদা করে অর্থ বরাদ্দেরও দরকার নেই। ভৌত ও কারিগরি সক্ষমতার দিক থেকে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ঘাটতি লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে সওজ এবং আরইবি'র সক্ষমতা তুলনামূলক বেশি। তবে এলজিইডি (উপজেলা পর্যায়) ও পাউবোতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও লজিস্টিকসের ঘাটতি রয়েছে। উপরন্তু, কিছু কিছু এলাকায় বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে ই-জিপি পরিচালনায় সমস্যা হয়। কারিগরি সক্ষমতার ক্ষেত্রে পাউবো, আরইবি ও এলজিইডি'তে (উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়ে) প্রয়োজনের তুলনায় কম কম্পিউটার, সার্ভার স্লো থাকা, ইন্টারনেটের গতি কম থাকা, ব্রডব্যান্ড সংযোগ না থাকার সমস্যা বিদ্যমান। ক্ষেত্র বিশেষে ওয়াইফাই সংযোগ কিংবা অফিস কর্তৃক ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হলেও কার্যকর থাকতে দেখা গেছে।

অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল থাকলেও কিছু ক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষ করা যায়, যেমন এলজিইডি'র উপজেলা পর্যায়ে ও পাউবো'র কার্যালয়গুলোতে অনুমোদিত পদের বিপরীতে জনবলের ঘাটতি রয়েছে। এলজিইডি'র অধিকাংশ উপজেলা প্রকৌশলীই একাধিক উপজেলার দায়িত্ব পালন করতে দেখা গেছে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের ঘাটতি রয়েছে। ক্রয় প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তি, বিশেষকরে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কম্পিউটারের মাধ্যমে ই-জিপি পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যবহারিক জ্ঞান বা সদিচ্ছার ঘাটতি রয়েছে (যেমন আরইবি)। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অফিসের কম্পিউটার অপারেটররা তাদের হয়ে ই-জিপি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এলজিইডি'র কোনো কোনো উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তারা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ পায় নি। আরইবি'র তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী কার্যালয় পর্যায়েও প্রশিক্ষণের ঘাটতি রয়েছে।

ই-জিপি গাইডলাইন অনুযায়ী ই-জিপি পরিচালনা করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও সবসময় পুরোপুরি অনুসরণ করা হয় না। কোনো প্রতিষ্ঠানেই সব ক্রয়ে ই-জিপি ব্যবহার করা হয় না। প্রতিষ্ঠানভেদে সর্বনিম্ন ২০% থেকে ৮৫% পর্যন্ত ক্রয় ই-জিপি'তে হয় না। জরুরি ভিত্তিতে ক্রয়, আন্তর্জাতিক ক্রয়, কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি, সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে ই-জিপি ব্যবহৃত হয়

না। এছাড়া আরইবি'র সমিতি পর্যায়ের ক্রয়ে ই-জিপি অনুসরণ করা হয় না। এলজিইডি'র ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক দরপত্র ও ক্ষেত্র বিশেষে শর্তের পরিপ্রেক্ষিতে দাতা সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত ক্রয় প্রক্রিয়ায় ই-জিপি অনুসরণ করা হয় না। এছাড়া উপজেলা পরিষদের ক্রয়ে অনেক জায়গায়ই ই-জিপি পুরোপুরি চালু হয় নি। সামরিক বাহিনীর দ্বারা সম্পাদিত কাজের ক্ষেত্রে ই-জিপি অনুসরণ করা হয় না।

কোনো প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা দেওয়া হয় না। কোন পর্যায়ের কর্মকর্তা কত টাকার ক্রয়ের কার্যাদেশ দিতে পারবেন তা 'ডেলিগেশন অব ফিন্যান্সিয়াল পাওয়ার' অনুযায়ী সব প্রতিষ্ঠানে নির্ধারণ করা আছে। তবে প্রতিষ্ঠানভেদে এর এই ক্রয়সীমার কিছুটা তারতম্য রয়েছে।

ক্ষেত্র ২: ই-জিপি প্রক্রিয়া

ই-জিপি প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি স্কোর পেয়েছে সওজ (৬৪%); এর পরেই রয়েছে পাউবো (৬০%)। ই-জিপি গাইডলাইন অনুযায়ী সব ই-জিপি ব্যবহারকারীদের ই-জিপি ব্যবস্থায় নিবন্ধিত হওয়া বাধ্যতামূলক হলেও তিন ধরনের প্রতিষ্ঠান ই-জিপিতে নিবন্ধিত - ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান, ঠিকাদার ও ব্যাংক। ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধিত হলেও ঠিকাদারকে নিয়মমাফিক ফি দিয়ে নিবন্ধন করতে হয়। ই-জিপি চালুর প্রথম দিকে অধিংকাশ ঠিকাদারই সংশ্লিষ্ট অফিসের সহায়তায় ই-জিপিতে নিবন্ধিত হয়েছে, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৬,০০০ থেকে ১০,০০০ টাকার বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার অপারেটরদের মাধ্যমে ই-জিপি আইডি খোলা ও নিবন্ধন সম্পন্ন করেছে। তবে কোনো কোনো ঠিকাদার নিজেই নিবন্ধন করেছে।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সবগুলো প্রতিষ্ঠানে টিইসি গঠন করা হয়। তবে কোনো কোনো সময় টিইসি'র সদস্যদের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার অপারেটররা তাদের পক্ষে লগ-ইন করে দরপত্র খোলেন। দরপত্র খোলার আগে ঠিকাদারদের পরিচয় গোপন থাকার নিয়ম থাকলেও কোনো প্রতিষ্ঠানেই এটি গোপন থাকে না। উপরন্তু, কোনো কোনো কার্যালয়ের অফিসের কম্পিউটার অপারেটররাই টাকার বিনিময়ে ঠিকাদারদের হয়ে দরপত্র দাখিল করে। কোনো প্রতিষ্ঠানই প্রাক-টেন্ডার মিটিং করে না। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সব প্রতিষ্ঠানেই দৈনিক পত্রিকা ও ই-জিপি পোর্টালে ক্রয় সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হলেও কিছু কিছু উপজেলার দরপত্র এখনো ই-জিপিতে না হওয়ায় সেগুলোর বিজ্ঞাপন ই-জিপি পোর্টালে দেওয়া হয় না।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সবগুলো প্রতিষ্ঠানেই নিয়ম অনুযায়ী টেন্ডার ইভ্যালুয়েশন কমিটি (টিইসি) গঠন ও দরপত্র মূল্যায়ন করা হয়। সওজ ছাড়া আর কোনো প্রতিষ্ঠানে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে দরপত্র মূল্যায়ন করা হয় না। মূল্যয়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ঠিকাদারদের জমা দেওয়া কাগজপত্র পূর্ণাঙ্গভাবে যাচাই-বাছাই করার ক্ষেত্রেও ঘাটতি বিদ্যমান। ঠিকাদারদের কোনো ডাটাবেজ না থাকায় তাদের কাজের অভিজ্ঞতা যাচাই ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে করতে হয়। মূল্যায়ন শেষে যে ঠিকাদার সকল বিবেচনায় যোগ্য বিবেচিত হন তাকে কাজের জন্য চূড়ান্ত বাছাই করা হয়। চূড়ান্তভাবে বাছাইয়ের পর ই-জিপি সিস্টেমে এবং মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে জানিয়ে দেওয়া হয়।

ক্ষেত্র ৩: ই-জিপি ব্যবস্থাপনা

ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনায় ঠিকাদারদের কর্ম-পরিকল্পনা দাখিল করতে হয়, এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে ঠিকাদারকে ই-জিপি চুক্তি ব্যবস্থাপনা টুলস ব্যবহার করতে হয়। তবে ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা কোনো প্রতিষ্ঠানেই এখনো বাস্তবায়ন হয় নি। অন্যদিকে কার্যাদেশ বাস্তবায়ন তদারকি প্রক্রিয়াও এখনো ই-জিপি ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হয় নি।

ক্ষেত্র ৪: স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্রের অধীনে তিনটি নির্দেশকে সবচেয়ে বেশি স্কোর পেয়েছে সওজ (৩০%); এর পরেই রয়েছে এলজিইডি (২৫%)। এই তুলনায় আরইবি (২০%) ও পাউবো'র (১৯%) স্কোর এক্ষেত্রে বেশ কম। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত এলজিইডি ও সওজ কার্যালয়গুলোতে কার্যকর অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা বিদ্যমান। অন্যদিকে পাউবো ও আরইবি'তে অভিযোগ করলেও সমাধান না হওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই নিয়মিত নিরীক্ষা (বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ) হয়, যার মধ্যে ই-জিপির কার্যক্রমও অন্তর্ভুক্ত। আবেদনের ভিত্তিতে নিরীক্ষা প্রতিবেদনে সাধারণ জনগণের অভিগম্যতা রয়েছে। তবে ই-জিপি গাইডলাইন অনুযায়ী সিস্টেমে অডিট লগ রক্ষণাবেক্ষণ করার কথা থাকলেও কোনো প্রতিষ্ঠানই এটি মেনে চলে না। এছাড়া 'সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধি ১৯৭৯' অনুযায়ী সব সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রত্যেক পাঁচবছর অন্তর সম্পদের বিবরণী ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে দাখিল করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত কোনো প্রতিষ্ঠানেরই কর্মকর্তা-কর্মচারী সম্পদের তথ্য প্রকাশ করেন না।

ক্ষেত্র ৫: কার্যকরতা

ই-জিপি প্রবর্তনের ফলে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া সহজতর হয়েছে, টেন্ডার বাক্স ছিনতাই, টেন্ডার সাবমিট করতে না দেওয়া, কার্যালয় ঘেরাও করা ইত্যাদি বন্ধ হয়েছে। তবে এগুলো বন্ধ হলেও দুর্নীতি কমার সাথে ই-জিপি'র তেমন কোনো সম্পর্ক নেই বলে প্রায় সব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারাই মতপ্রকাশ করেছে। ই-জিপি প্রবর্তন সত্ত্বেও নানা ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতি বিদ্যমান।

রাজনৈতিকভাবে কাজের নিয়ন্ত্রণ ও ঠিকাদারদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া অভিযোগ রয়েছে। কিছু কিছু এলাকায় কোনো বিশেষ কাজে কারা টেন্ডার সাবমিট করবে সেটা রাজনৈতিক নেতা বিশেষ করে স্থানীয় সংসদ সদস্য ঠিক করে দেন। অনেক ক্ষেত্রে একটি বড় লাইসেন্সের অধীনে কাজ নিয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা তার কর্মীদের মাঝে বণ্টন করে দেন।

দরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অবহেলা, নিজেরা কাজ না করে কম্পিউটার অপারেটরদের মাধ্যমে মূল্যায়ন রিপোর্ট তৈরি করানো, নম্বর বাড়িয়ে-কমিয়ে আনুকূল্য দেওয়া ইত্যাদির অভিযোগ রয়েছে। অফিস কর্মকর্তা কর্তৃক ঠিকাদারদের রেট শিডিউল জানিয়ে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। অফিসের কম্পিউটার অপারেটরদের সাহায্যে নিয়ম-বহির্ভূত কাজ করানো হয়। লিমিটেড টেন্ডার মেথড (এলটিএম)-এ কার্যাদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের ঘুষ আদায় করা অভিযোগ পাওয়া যায়। এছাড়া কাজ তদারকি, অগ্রগতি প্রতিবেদনে ভুল তথ্য দেওয়া, কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর বিল তুলতে ঘুষ আদায় করার অভিযোগ রয়েছে।

ঠিকাদারদের মধ্যে যোগসাজশের অভিযোগ রয়েছে। ওপেন টেন্ডার মেথড (ওটিএম)-এ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আগে থেকেই সিন্ডিকেট করা থাকে বলে অভিযোগ রয়েছে। কিছু কিছু এলাকায় ঠিকাদার, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট অফিসের কর্মকর্তাদের মধ্যে যোগসাজশের অভিযোগ পাওয়া যায়। এছাড়া অবৈধভাবে কাজ বিক্রি করে দেওয়া বা সাব-কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়, এবং একজনের সার্টিফিকেট ও লাইসেন্স ব্যবহার করে কাজ নেওয়া ও অন্য জনের কাজ করা হয়। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে চাঁদা দেওয়া বা দিতে বাধ্য হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার বাইরের ঠিকাদারদের কাজ করতে না দেওয়াও অভিযোগ রয়েছে।

অনদিকে ই-জিপি পদ্ধতিতে তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছ হওয়ার কারণে ভালো ও দক্ষ ঠিকাদারদের কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ফলে কাজ বাস্তবায়নে দুর্নীতি কম হওয়াসহ কাজের মান ভালো হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। তবে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তাদের অধিকাংশের মতে, ই-জিপি'র সাথে কাজের মানের সম্পর্ক নেই। তথ্যদাতাদের মতে ই-জিপি'র কারণে কাজ ভালো হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও কাজ বিক্রি করার কারণে তা নষ্ট হচ্ছে।

২.৩. ই-জিপি'র ইতিবাচক প্রভাব

ই-জিপি'র প্রবর্তনের সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। প্রথমত, ই-জিপি'র ফলে শিডিউল ছাপানো, শিডিউল কেনা ও জমা দেওয়া, নথি সংগ্রহ ও যাচাই করা এগুলো কমে যাওয়ার কারণে সময়ক্ষেপণ কমে গেছে। দ্বিতীয়ত, সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া সহজতর হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ের কার্যালয়ে ক্রয়ের সুবিধা, দেশের যেকোনো জায়গা থেকে দরপত্র জমা দেয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। তৃতীয়থ, দরপত্র জমা-সংক্রান্ত যেসব সমস্যা, যেমন দরপত্র নিয়ে সব ধরনের দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মারামারি, বোমা হামলা, দরপত্র বাক্স ছিনতাই ও চুরি, দরপত্র জমায় বাধা দেওয়া, দরপত্র বাক্স নিয়ে আসতে বাধাসহ টেন্ডারবাজি ইত্যাদি দূর হয়েছে এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। চতুর্থত, দরপত্র মূল্যায়নে দুর্নীতি কমে গেছে। আগে দরপত্র হারিয়ে যাওয়া, দরপত্রের কাগজপত্র হারানো বা চুরি হওয়া ইত্যাদি ঘটনা হ্রাস পেয়েছে। এখন কোনো নথি পরিবর্তন করা যায় না (অভিজ্ঞতার সনদ ছিঁড়ে ফেলে অযোগ্য বা কম যোগ্য দেখানো, 'লেস' পরিবর্তন করা ইত্যাদি)। পঞ্চমত, ই-জিপি'র কারণে সবার অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২.৪. ই-জিপি বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতা

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ই-জিপি বাস্তবায়নে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা যায়। প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রে প্রথমত উপজেলা পর্যায়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভৌত ও কারিগরি সমস্যা বিদ্যমান, যার মধ্যে ইন্টারনেটের কম গতি, লজিস্টিকসের ঘাটতি, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ঘাটতি, টেন্ডার ওপেন করার জন্য অপর্যাপ্ত সময় (মাত্র এক ঘণ্টা), ঠিকাদারদের নথিপত্র ম্যানুয়াল ভেরিফিকেশন করতে হওয়ার ফলে সময়ক্ষেপণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয়ত, কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত ও প্রশিক্ষিত জনবলের ঘাটতির ফলে দায়িত্বরত কর্মকর্তাদের উপর কাজের চাপ বাড়ছে। তৃতীয়ত, দক্ষতার ঘাটতির কারণে দুর্নীতির সুযোগ তৈরি হয়েছে। চতুর্থত, ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের ই-জিপি বাস্তবায়নে ঘাটতি বিদ্যমান, যেমন সম্পূর্ণভাবে ই-জিপি অনুসরণ না করা, সব ক্রয় এখনো ই-জিপি'তে না করা, প্রকল্পের কাজ পরিবর্তন হওয়ার অজুহাতে এপিপি ওয়েবসাইটে না দেওয়া, এবং প্রাক-দরপত্র মিটিং না করা।

অন্যদিকে কেন্দ্রীয় (সিপিটিইউ) পর্যায়ে কিছু সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা যায়। প্রথমত, সব ঠিকাদারের তথ্য সংবলিত কোনো কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার এখনো নেই। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় বা সমন্বিত ও স্বয়ংক্রিয় মূল্যায়ন কাঠামোর ঘাটতি রয়েছে। তৃতীয়ত, দরদাতাদের জন্য সমন্বিত সনদের ব্যবস্থা নেই। চতুর্থত, ক্রয় সংক্রান্ত প্রধান অংশীজন (ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান, ঠিকাদার ও ব্যাংক) ই-জিপিতে নিবন্ধিত হলেও অন্যান্য অংশীজন এখনো নিবন্ধিত নয়। সবশেষে ঠিকাদারদের প্রশিক্ষণও অপর্যাপ্ত।

৩. সার্বিক পর্যবেক্ষণ

সার্বিকভাবে বলা যায় সরকারি ক্রয়ে ই-জিপি'র প্রবর্তন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক পদক্ষেপ হলেও এখনো সব প্রতিষ্ঠানের সব ধরনের ক্রয়ে এর ব্যবহার হচ্ছে না - ই-জিপি'র ব্যবহার এখনো ক্রয়াদেশ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। ই-জিপি প্রবর্তনের অন্যতম উদ্দেশ্য - দুর্নীতি হ্রাস ও কাজের মানের ওপর ই-জিপি'র কোনো প্রভাব লক্ষ করা যায় না। ক্রয় প্রক্রিয়া সহজতর হলেও কার্যাদেশ পাওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব, যোগসাজশ, সিন্ডিকেট এখনও কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করছে। কার্যাদেশ বিক্রি, অবৈধ সাব-কন্ট্রাক্ট, কাজ ভাগাভাগির কারণে কাজের মানের ওপর কোনো ইতিবাচক প্রভাব নেই। ই-জিপি ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানগুলো এখনো কোনো কোনো কাজে ম্যানুয়াল পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল। ফলে ই-জিপি'র মূল উদ্দেশ্য (অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, নিরপেক্ষ মূল্যায়ন) অনেকখানি

ব্যাহত হচ্ছে। ফলে বলা যায় ই-জিপি প্রবর্তনের ফলে ম্যানুয়াল থেকে কারিগরি পর্যায়ে সরকারি ক্রয়ের উত্তরণ ঘটলেও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের একাংশ দুর্নীতির নতুন পথ খুঁজে নিয়েছে। বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তরণ ঘটলে ই-জিপি'র সুফল পুরোপুরি পাওয়া যাবে।

৪. সুপারিশ

১. ই-জিপি'কে রাজনৈতিক প্রভাব, যোগসাজশ ও সিন্ডিকেটের দুষ্টচক্র থেকে মুক্ত করতে হবে; সেই লক্ষ্যে সকল পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি ও জনগুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে অবস্থিত ব্যক্তির রাষ্ট্রের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যবসায়িক সম্পর্কের সুযোগ বন্ধ করতে হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

২. প্রত্যেক ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের সব ধরনের ক্রয় ই-জিপি'র মাধ্যমে করতে হবে।
৩. ই-জিপি পরিচালনার জন্য কাজের চাপ ও জনবল কাঠামো অনুযায়ী ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানে জনবল বাড়াতে হবে।
৪. ই-জিপি'র সাথে সম্পর্কিত সব অংশীজনকে প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। এর জন্য প্রতি জেলায় সিপিটিইউ'র তত্ত্বাবধায়নে একটি প্রশিক্ষণ ইউনিট গঠন করতে হবে, যারা মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময় পর পর ঠিকাদার, ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
৫. প্রত্যেক ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রত্যেক অর্থবছরের শুরুতে তৈরি করতে হবে ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

ই-জিপি প্রক্রিয়া

৬. প্রত্যেক ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানে প্রাক-দরপত্র মিটিং নিশ্চিত করতে হবে।
৭. ঠিকাদারদের একটি অনলাইন ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে যেখানে সকল ঠিকাদারের কাজের অভিজ্ঞতাসহ হালনাগাদ তথ্য থাকবে; কাজের ওপর ভিত্তি করে ঠিকাদারদের আলাদা শ্রেণিবিন্যাস করতে হবে, যা সঠিক ঠিকাদারকে কার্যাদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।
৮. সিপিটিইউ-এর পক্ষ থেকে একটি সমন্বিত স্বয়ংক্রিয় দরপত্র মূল্যায়ন পদ্ধতি থাকতে হবে যা সব সরকারি ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করবে।

ই-জিপি ব্যবস্থাপনা

৯. সিপিটিইউ-এর পক্ষ থেকে ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা ও কার্যাদেশ বাস্তবায়ন তদারকি ই-জিপি'র অধীনে শুরু করতে হবে।

স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও কার্যকরতা

১০. প্রত্যেক ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানকে ই-জিপি গাইডলাইন অনুযায়ী নিরীক্ষা করাতে হবে।
১১. দরপত্র সংক্রান্ত সব তথ্য ও সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের জন্য স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ করতে হবে।
১২. প্রত্যেক ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের ই-জিপি'র সাথে জড়িত সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিজস্ব ও পরিবারের অন্য সদস্যদের আয় ও সম্পদের বিবরণী প্রতিবছর শেষে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিতে হবে ও তা প্রকাশ করতে হবে।
১৩. প্রত্যেক ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম স্থানীয় পর্যায়ে তদারকি করতে হবে এবং এ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ থাকতে হবে। এর জন্য স্থানীয় জনগণের পক্ষ থেকে তদারকির (কমিউনিটি মনিটরিং) চর্চা শুরু করা যেতে পারে। একইভাবে প্রত্যেক ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিতভাবে গণশুনানি আয়োজন করতে হবে।

****